নিবন্ধের সারাংশ :-

পত্রিকা রচনা ও সম্পাদনা : ঔপনিবেশিক যুগে বঙ্গনারীর আত্মপরিচিতি নির্মাণের প্রয়াস

শিপ্রা সরকার*

মূলকথা ঃ স্বাধীনতা উত্তর সময়পর্বে মানবী বিদ্যাচর্চায় একটা বড় জায়গা জুড়েই রয়েছে নারীর আত্মপরিচিতি নির্মাণের বিষয়টি। বর্তমানে দেশ-কাল ভেদে নারীর স্বাধীন কণ্ঠস্বরের ইতিহাস গবেষণার প্রতি ঝোঁক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মনন, পরিবেশ – সর্বতত্র স্বাধীন নারীর অতীত অনুসন্ধানের কাজ চলছে আবার চলছে প্রাপ্ত স্বাধীনতার মূল্যায়ণও। বর্তমান প্রবন্ধটিতে মূলত ব্যাখ্যা করা হয়েছে পত্রপত্রিকার সম্পাদনা তথা সারস্বত চর্চায় নারীর অবদানকে। বর্তমান যুগেও নারীরা নিজেদের উদ্যোগে বহু প্রবন্ধ রচনা তথা বিভিন্ন ধরনের লেখালিখি তো বটেই এমনকি বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনাও করে থাকেন, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধটিতে তারই অতীত ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাংলার নারী-লিখিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলির নিবিড় পাঠে তা থেকে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল তা অনুধাবন করা যায়। বলাবাহুল্য লেখিকা-সম্পাদিকা-পাঠিকা — এই সম্পূর্ণ নারীবৃত্তের আত্মমর্যাদা ও আত্মপরিচিতি নির্মাণে এবং বাংলা তথা ভারতে ভবিষ্যৎ নারীবাদের (ফেমিনিজম) বিকাশে এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। এই সামগ্রিক বিষয়টিই মূল প্রবন্ধটিতে ক্ষুদ্র পরিসরে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ নারী শিক্ষা, ঔপনিবেশিক বাংলা, নারী প্রগতি ও নারী উন্নয়ন নারীবাদী দর্শন।

*সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

পারিবারিক এবং সামাজিক বৈষম্য ও অবমাননার মধ্য দিয়েই উনিশ শতকে বাঙালি নারীর আত্মপরিচিতি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই এই প্রয়াস শুরু হয়ে গিয়েছিল নারীদের শিক্ষাদানের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। যদিও মনে করা হয় যে, নারীদের শিক্ষিত করবার প্রচেষ্টা প্রথম এসেছিল পুরুষ সমাজের মধ্য থেকেই, তথাপি বলা চলে পুরুষদের সেই উদ্যোগ একদিকে যেমন ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রয়োজনভিত্তিক, অন্যদিকে তেমনই নারীদের মধ্যেও শিক্ষালাভের বাসনা বা ইচ্ছাকে এখানে অবহেলা করা যায় না। রাস সুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী গুপ্তা প্রমুখের রচনা থেকে তা স্পষ্টতই অনুমান করা যায়। আসলে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ সমাজ নিজেদের উন্নত, প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরতে শিক্ষিত পাত্রী বিবাহতেই অধিকতর ঝুঁকে ছিল, যাতে তাদের নিয়ে শিক্ষিত মধ্য বা উচ্চবিত্তিয় সমাজ সংস্কৃতিতে যোগ দেওয়া যায়। এটাই ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ সমাজের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা। বড়জোর নারীকে সুগৃহীনী, সুমাতা হিসাবে গড়ে তুলে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে উন্নত করাই ছিল নারী শিক্ষার এই পর্বের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্নতি, ব্যক্তিগত আত্মতুষ্টি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের কোনও জায়গাই এই শিক্ষাব্যবস্থাতে ছিল না।

নারী শিক্ষা বিষয়ে এই প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলার কারণ হল, নারীর এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সীমবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকলেও তা কিন্তু উনিশ শতকের শেষ বা বিশের শুরুতে বাঙালি নারীর আত্মপরিচিতি নির্মাণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। প্রথম পর্বের এই শিক্ষিত নারীরাই পরবর্তীকালে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাশীল করে তুলবার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁরা সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবী কার্যকলাপ তো বটেই বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজকর্ম প্রভৃতিতেও অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাতেও আসতে থাকেন। এসবের পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে নারীদের সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, কর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির বিষয়ে প্রচার চালাতে থাকেন এবং এসব বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁরা বেশকিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কাজকর্ম চালাতে শুরু করেন। এই সমস্ত পত্রিকা ও সংগঠনগুলিই পরবর্তীকালে নারী প্রগতি এবং নারী উন্নয়নের একেকটি বড় উদ্যোগ তথা প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই নারীদের উদ্যোগে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলি কোনওটি ছিল পাক্ষিক, আবার কোনও টি মাসিক। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'বঙ্গমহিলা', যা ছিল মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় ১২৮২-এর শ্রাবণ মাস থেকে 'অনাথিনী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই পর্বে নারীরা পত্র-পত্রিকায় সাধারণত নিজেদের নাম ব্যবহার করতেন না, থাকমণি দেবীই কিন্তু প্রথম এক্ষেত্রে নিজের নাম ব্যবহার করেন। ১৩০৪-এর আশ্বিন মাস থেকে ঠাকুর পরিবারের সদস্য প্রজ্ঞাসুন্দরী

দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একটি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকা গৃহস্থ নারীদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। কেননা, এতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, হস্তশিল্পবিদ্যা প্রভৃতি তো বটেই আহার ইত্যাদি বিষয়েও বহু লেখালিখি প্রকাশিত হত।

১২৮৪ সালের মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। কালক্রমে পত্রিকা সম্পাদনার হাল ধরেন ঠাকুর পরিবারের নারীরা। স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী প্রমুখ এর সম্পাদনার সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হন। উনিশ এবং বিশ শতকেও ভারতীর ন্যায় এরকম বহু পত্রিকা ছিল যেগুলি পুরুষের হাত ধরে শুরু হলেও কালক্রমে নারীরাই এগুলির সম্পাদনার হাল ধরেন। এরকমই আরেকটি পত্রিকা হল 'পরিচারিকা'। ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার-এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হতে থাকে। কালক্রমে এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তাঁর পুত্রবধূ মোহিনী দেবী। পরে সুচারু দেবী, নিরূপমা দেবী, মণিকা দেবী প্রমুখ এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হন। এছাড়া, 'নব্যভারত' (১২৯০, জ্যৈষ্ঠ), 'বাঙ্গালার কথা' (১৩২৮, আশ্বিন), 'ত্রিপুরা হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিকেই এই বর্গে ফেলা যায়। 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকাটি প্রকাশ করেতেন চিত্তরঞ্জন দাস। নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে নানা আলোচনা করা হত এই পত্রিকায়। চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করলে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী পত্রিকাটির সম্পাদনা করতে থাকেন।

উনিশ শতকে বেশকিছু পত্রিকার সম্পাদনায় নারী-পুরুষকে একতেত্র কাজ করতে দেখা যায়। ১৩৩০-এর জ্যৈষ্ঠে যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সেবা ও সাধনা'। দ্বিতীয়বারে অবশ্য ইন্দুনিভা দেবী একাই সম্পাদনা করেন। এছাড়াও প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অর্ঘ্য' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা (১৩৩৪, ফাল্গুন)। রঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আলোক'-এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত সাহিত্যচর্চা। বলাবাহুল্য, সারস্বতচর্চার গণ্ডিতে নারী পুরুষের এই সমমর্যাদা নিঃসন্দেহে নারীর আত্মমর্যাদার বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

তবে, নারীরা কিন্তু নিজেদের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের জন্যেও পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'বালক' পত্রিকাটির কথা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার থেকে জ্ঞাননন্দিনী দেবী ১২৯১-এর বৈশাখ মাসে পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু করেন। শিশুমনের বিকাশের উপযোগী নানারকম গল্প, ছড়া, কৌতুক রচনা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছিল সচিত্র এই মাসিক পত্রিকাটিতে। বিভাবতী সেন ১৩৩৪ সালের বৈশাখে ছোটোদের জন্য 'পাপিয়া' নামে একটি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। আবার শিশুকে যথাযথ লালন পালন করে ভবিষ্যত জাতি গঠনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাণী হালদার ও বেলা ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৩৫৫-এর শ্রাবণ মাস থেকে 'ছেলেমেয়ে' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

বলাবাহুল্য যে, উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি (স্বাধীনতার আগে) পর্যন্ত নারীদের দ্বারা সম্পাদিত এবং নারীদের জন্য, নারীদেরই লিখিত এরকম বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলি থেকে নারীদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থানের চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনই নারীদের রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তা, মতাদর্শ প্রভৃতিও অনুধাবন করা যায়। নারী প্রগতির ইতিহাস লিখতে গেলে এইসব পত্রিকাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এগুলি থেকে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান কীভাবে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল তার একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। পরাধীনতার পটভূমিকায় নারীর রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তা, অংশগ্রহণ, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির চিত্র পেতে পত্রিকাগুলিই একেকটি আকর। যদিও, তার বিপুল পরিসরকে নিবন্ধের নাতিদীর্ঘ কলেবরে সংযুক্ত করা হয়নি।

তবে নারীর অন্তঃপুর-জীবন-যাপনের অবসর বিনোদনের সঙ্গী যে এইসব পত্রিকাগুলি হয়ে উঠতে পেরেছিল, তা এদের ক্রমবর্ধমান মাত্রা থেকেই বোঝা সম্ভব হয়েছিল, বলাবাহুল্য জনপ্রিয়তা ছিল এই সংখ্যাধিক্যের অন্যতম একটি কারণ। পাঠিকাসমাজ সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের শেষে নিজের সঙ্গে একলা সময় কাটানোর জন্য একটু সময় যেমন খুঁজেছিলেন, তেমনই লেখিকা-সম্পাদিকারাও এর মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। ফলত, অল্পবিস্তর লাভবান উভয়পক্ষই হয়েছিল। সেইসঙ্গে ভেবে দেখতে হবে, নারীদের বিনোদন-যাপনে একটা নবতম সংযোজন ছিল এই পত্রিকাগুলি। পত্রিকাগুলির নামের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা একদিকে যেমন সেগুলির সম্পাদিকা প্রতিষ্ঠাতাদের শিল্পরুচির পরিচয় দেয়, অন্যদিকে তেমনই সেগুলি কিন্তু পরাধীন জাতির ভাবাবেগকে বুঝতে সাহায্য করে, পরাধীন নারীর মননকে বুঝতে সাহায্য করে। 'ভারতী', 'পুণ্য', 'নব্য-ভারত', 'ভারত-লক্ষ্মী' (যোগমায়া মাতাজী, ১৩১৭), 'মুক্ত' (তরুবালা সেন, ১৩৩৭), 'মেয়েদের কথা' (কল্যাণী সেন, ১৩৪৮) প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম যথেষ্টই অর্থব্যঞ্জক এবং চিন্তাপ্রসূত। তবে, এই সমস্ত পত্রিকাগুলি প্রকাশে নারীরা অবশ্যই পরিবারের কিছুটা হলেও সমর্থন পেয়েছিল, না হলে এগুলির প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হত। আর অনেকক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন পেয়েছিলেন। তবে, এইসব পত্রিকাগুলি কিন্তু মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল; পাঠক-প্রকাশক-সম্পাদক উভয় দিক থেকেই একটা কথা খাটে। নবগঠিত মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলা সম্প্রদায়ের বাইরে এগুলি খুব একটা ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। উঠতি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির এগুলি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে বর্গ এবং বর্ণে উচ্চতা বিশিষ্ট নারী সমাজের বাইরে যারা অল্প বিত্তের অধিকারী, তাদের জন্য প্রকাশিত একটি পত্রিকাও নজর কাড়ে। ১৩১৮ সালে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মাহিষ্য-মহিলা' পত্রিকা। নদীয়া থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল মাহিষ্য সমাজের (জাতের বা কাস্টের) উন্নতি-প্রচেষ্টা।

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাংলাতে কিছু নারী সংগঠন তথা মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গঠিত এইসব সংগঠনগুলি নিজেদের ভাবাদর্শ তুলে ধরার জন্য বা কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবার জন্য মুখপত্র প্রচার করত। বলাবাহুল্য এগুলিতে নারীর বিচিত্র কার্যকলাপের যে উল্লেখ থাকত, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, যা থেকে আলোচ্যপর্বে নারী প্রগতির ধারাটিকে অনেকটা চিহ্নিত করা যায়। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে বাংলার খ্রিস্টান মহিলারা মিলে 'বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় মহিলা সমাজ' নামে যে সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন, সেখান থেকে প্রকাশিত হত' খ্রিস্টীয় মহিলা' নামক পত্রিকা (১২৮৭ সালের মাঘ মাস) । এটির সম্পাদনা করতেন কামিনী শীল। সাহিত্যচর্চার ধারায় এই পত্রিকাটির বিশেষ সুনাম ছিল। ১৮৯৮ খ্রি: (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) বনলতা দেবীর সম্পাদনায় 'সুমতি সমিতি'র মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় 'অন্তঃপুর' নামক পত্রিকাটি। সমিতির কার্যকলাপের বিচিত্র ধারার আভাস এবং বিভিন্ন চিন্তা-ঋদ্ধ প্রবন্ধ এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে সরোজনলিনী দত্তের 'নারীমঙ্গল' সমিতি থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 'বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা'। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হেমলতা ঠাকুর। নারী সমাজের উন্নতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হত। ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে বাঁকুড়া 'তরুণী সংঘ' থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'জাগরণ'। পত্রিকাটি সুদীর্ঘজীবী না হলেও বহু মনন-সমৃদ্ধ পত্রিকা এতে প্রকাশিত হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আলোচ্যপর্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, এমনকি সর্বভারতীয় স্তরেও গড়ে ওঠা বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলি তাদের নিজেদের ভাবাদর্শ, কর্মসূচী ইত্যাদি প্রচার করতে মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ করত। যেমন -- মাদ্রাজে স্থাপিত 'ওমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৯১৭)-এর মুখপত্র ছিল 'স্ত্রী-ধর্ম'; 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল

অফ ওমেন ইন ইন্ডিয়া' (১৯২৫)-এর মুখপত্র ছিল 'রোশনি' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, বাংলায় এই সমস্ত উদ্যোগ কিন্তু বিশ শতকের বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তবে, উল্লেখ করা দরকার যে, আলোচ্য পর্বের পত্রিকাগুলিতে একদিকে যেমন নারীর প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে অনেকসময়ই নারীর গৃহের বাইরে বেরিয়ে শিক্ষাগ্রহণ, পুরুষের সঙ্গে সমান সারিতে চলাফেরা করা ইত্যাদির সমালোচনা করা হয়েছে নারী-লেখনীতেই। সমসাময়িক যুগের প্রেক্ষিতে নারীর এই মানসিকতা হয়ত অ-স্বাভাবিক নয়। আসলে মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি-দর্শন নিয়েই তার মনের বিকাশ হয়। তদানীন্তন পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও তাই নারীর মনের বিকাশ ঘটেছিল পুরুষতান্ত্রিক ন্যায়-নীতি-দর্শনের ধাঁচেই। আবার এই চরম পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিল নারী স্বাধীনতার দাবি, নারীর আত্মপরিচিতির দাবি তথা নারীর স্বাধীন কণ্ঠস্বর। আর এই কাজেই বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় উনিশ-বিশ (স্বাধীনতার পূর্বে) শতকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলির।

পরিশেষে, সাম্প্রতিককালে ভারতে নারীবাদী দর্শনের (ফেমিনিজম) যে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, তার একেবারে প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের (জিরল্ডিন ফোর্বস কথিত 'ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম') উদ্ভব ও বিকাশে যে উনিশ-বিশ (মধ্যভাগ পর্যন্ত) শতকে বঙ্গনারীদের লিখিত ও সম্পাদিত পত্রপত্রিকাগুলির বিশেষ অবদান ছিল, তা বিশেষভাবে এই পরিসরে উল্লেখের দাবি রাখে। কেননা নারীর চিন্তা ও চেতনার পরিমণ্ডল একদিকে যেমন এইসব পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনই এগুলিকে নারীর রূপান্তরিত চিন্তা-চেতনার ফসলও বলা চলে, যা দিনে-দিনে নারীর মর্যাদায় উত্তরণ ঘটাচ্ছিল এবং একইসঙ্গে চিহ্নিত করছিল সেই চিন্তা-চেতনা-মননের রূপান্তর-উত্তরণকে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

<u>বাংলা ভাষা :</u>

(১) গুপ্তা, কৈলাসবাসিনী (১৭৮৭ শক), 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি', স্বপন বসু (সম্পাঃ), উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা -১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১২।

(২) ঘোষ, সারদা (২০১৩), নারী চেতনা ও সংগঠন : ঔপনিবেশিক বাংলা : ১৮২৯-১৯২৫, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা।

(৩) তর্করত্ন, তারাশঙ্কর (১৮৫১), 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', স্বপন বসু (সম্পাঃ), উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষা : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা - ১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১২।

(৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৫৭), সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

(৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৭৭; ১৩৮৪), সংবাদপত্রে সেকালের কথা - দুই খণ্ড, কলিকাতা।

(৬) বসু, স্বপন (১৪১২) (সম্পাঃ), উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থামালা -১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা।

(৭) বসু, স্বপন (২০০৩) (সম্পাঃ), সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা।

(৮) বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (২০০৩) (সম্পাঃ), উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

ইংরাজী ভাষা :

1) Engles, Dagmar (1996), *Beyond Purdah? women in Bengal : 1890-1939*, New Delhi.

2) Forbes, Geraldine (1996), *The Cambridge History of India : women in modern India*, Cambridge University Press, New Delhi.

3) Forbes, Geraldine (2005), *women in colonial India : Essays on Politics. Medicine and Historiography*, New Delhi.

4) Meredith, Borthwrick (1984), The Changing Role of women in Bengal, 1849-1905, Princeton.

5) Murshid, Ghulam (1983), *Reluctant Debutante : Response of Bengali women to Modernization, 1849-1905*, Rajsahi.